ছাগল পালন বিষয়ক
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

রচনা ও সম্পাদনা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ সায়েদুল হক

ডাঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ

সহযোগিতায়

কৃষিবিদ আজমারুল হক

মো ঃ মাইনুদ্দিন

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

বাড়ী-১৮, রোড-০৫, ব্লক-এ মিরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬।

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯০০৫৪৫২,৮৮০-২-৯০১৪৯৩৩,

E-mail ঃ zalam_idf@yahoo.com

প্রশিক্ষণ সূচী

দিন	সেসন	বিষয়	সময়	প্রশিক্ষণের ধরণ
১ম দিন	০১	নিবন্ধন	৯.০০-৯.৩০	
		উদ্বোধন	৯.৩০-৯.৪৫	
		- অংশগ্রহণকারীবৃন্দের পরিচিতি - প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য - প্রশিক্ষণ কালে করণীয় ও বর্জনীয়	৯.৪৫ -১০.৪৫	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		চা বিরতি	১০.৪৫-১১.১৫	
	০২	- আইডিএফ পরিচিতি	১১.১৫-১২.১৫	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		- অংশগ্রহণকারীদের প্রাক মূল্যায়ন	১২.১৫-১.০০	
		দুপুরের খাবার বিরতি	১.০০-২.০০	
	০৩	- ছাগল পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব - দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে ছাগল পালনের প্রভাব	২.০০-৪.৩০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		সারা দিনের আলোচনার সার সংক্ষেপ	৪.৩০-৫.০০	
২ য় দিন		পূর্ব দিনের আলোচনা	৯.০০-৯.৩০	
	৪	- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য - ছাগলের উৎপাদন ক্ষমতা	৯.৩০-১১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		চা বিরতি	১১.০০-১১.৩০	
	৫	- বংশ বিবরণের ভিত্তিতে ছাগল বাছাই, - প্রজনন ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপ্রজনন রোধ	১১.৩০-১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		দুপুরের খাবার বিরতি	১.০০-২.০০	
	৬	- গর্ভকালীন ও গর্ভপরবর্তী ছাগীর যত্ন - ছাগলের বাচ্চার যত্ন	২.০০-৪.৩০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		সারা দিনের আলোচনার সারসংক্ষেপ	৪.৩০-৫.০০	
৩ য় দিন		পূর্ব দিনের আলোচনা	৯.০০-৯.৩০	
	০৭	- ছাগলের সুষম খাদ্য পরিচিতি - সম্পূরক খাদ্য - দানাদার খাবার	৯.৩০-১১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		চা বিরতি	১১.০০-১১.৩০	
	০৮	- ইউ.এম.এস তৈরী - কাঁচা ঘাস চাষাবাদ ও সরবরাহ - দেশীয় পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ	১১.৩০-১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		দুপুরের খাবার বিরতি	১.০০-২.০০	
	০৯	ছাগলের স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	২.০০-৪.৩০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		সারা দিনের আলোচনার সার সংক্ষেপ	৪.৩০-৫.০০	

৪ র্থ দিন		পূর্ব দিনের আলোচনা	৯.০০-৯.৩০	
	১০	- ছাগলের প্রচলিত রোগ-বালাই পরিচিতি - রোগের লক্ষণ, করণীয়, প্রতিষেধক ও নিরাময়	৯.৩০-১১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		চা বিরতি	১১.০০-১১.৩০	
	১১	- ছাগলের টিকার নাম ও পরিচিতি - প্রয়োগ পদ্ধতি, সময়কাল, কলাকৌশল - ছাগলের খামারে জৈব নিরাপত্তা - ছাগল বাজারজাতকরণ	১১.৩০-১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া
		দুপুরের খাবার বিরতি	১.০০-২.০০	
	১২	ডিপিং, ভ্যাক্সিনেশন	২.০০-৪.৩০	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন
		সারা দিনের আলোচনার সার সংক্ষেপ	৪.৩০-৫.০০	
৫ম দিন		পূর্ব দিনের আলোচনা	৯.০০-৯.৩০	
	১৩	ছাগল পালনের জন্য মাচা তৈরী ও ঘর ব্যবস্থাপনা	৯.৩০-১১.০০	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন
		চা বিরতি	১১.০০-১১.৩০	
		ইউএমএস তৈরী	১১.৩০-১.০০	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন
		প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন		

ভূমিকা ঃ

ছাগল বাংলাদেশে অতিপরিচিত গৃহপালিত পশু। দেশের প্রায় ৯৩% ছাগল ক্ষুদ্র, দরিদ্র এবং ভূমিহীন কৃষক পরিবারে পালিত হয়ে থাকে। ছাগল শুধু মাত্র গরীবের সম্পদ। আয় বৃদ্ধি ও আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ছাগল পালনের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ছাগল পালনে স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন হওয়ায় ঝুঁকিও কম। ছাগল পালনে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হয়না। এদের রোগব্যাধিও কম। অল্প সময়ে বিক্রয় উপযোগী হয়। ছাগলের মাংস সুস্বাদু, কোমল, পুষ্টিকর ও সকলের কাছে অতি প্রিয়। সে কারণে ছাগল বাজারজাতকরণ সহজ। গ্রামের হাট বাজারে অনায়াসে বিক্রয় করে টাকা পাওয়া সম্ভব বলে একে ব্যাংক একাউন্ট বলা যেতে পারে। ছাগল থেকে কিছু পরিমাণ দুধও পাওয়া যায়। আর এই স্বল্প পরিমান দুধ বাজারে বিক্রয়যোগ্য নয় বলে গরীব প্রতিপালনকারী পরিবারের সদস্যগণই তা পান করে থাকেন। অথচ গাভী পালন করে দুধ খাওয়ার উপায় তাদের নাই। ছাগলই তাদের দুধ পানের একমাত্র উৎস্য। তাই ছাগলকে গরীবের গাভী বলা হয়। ছাগলের দুধ পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য। ছাগলের দুধের চর্বির পরিমাণ মাতৃদুগ্ধের অনেকটা কাছাকাছি বলে শিশুদের জন্য সহজে হজমযোগ্য। বাংলাদেশের ছাগলের চামড়ার মান অত্যন্ত উন্নত বিধায় মাংসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি চামড়া রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

ছাগলের জন্য গরু-মহিষের মতো চারণভূমির তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। ক্ষেতের আইলে, রাস্তার ধারে, বাড়ির আশ-পাশের ঘাস, লতা, পাতা খেয়ে এরা জীবন ধারণ করতে পারে। ছাগলের জন্য গরু- মহিষের মত অধিক খাদ্য, উন্নত বাসস্থান বা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। ফলে অল্প পুঁজিতে অল্প জায়গায় কয়েকটি ছাগল পালন করা যায়। তাই গরীব বিশেষ করে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী, যুবক যুবতী, দুস্থ মহিলারা গাভী ক্রয় করতে পারে না বলে ছাগল পালন সুবিধাজনক। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ছাগল পালনে সহযোগীতা করে থাকে। ছাগলের বিষ্ঠা উৎকৃষ্ট সার যা বাড়ীর আঙ্গিনায় শাক-সবজি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে রাসায়নিক সারের খরচ সাশ্রয় হয়।

সেসন -১

- অংশগ্রহণকারীবৃন্দের পরিচিতি
- প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য
- প্রশিক্ষণ কালে করণীয় ও বর্জনীয়

অংশগ্রহণকারীবৃন্দের পরিচিতি ঃ

প্রশিক্ষণের শুরুতেই প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে প্রশিক্ষক ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আন্তরিকভাবে কথা বলে পরিচিত হলে প্রশিক্ষণার্থীদের জড়তা ভেঙ্গে যাবে। তারা তখন মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ঃ এ প্রশিক্ষণ শেষে সুফলভোগীদের উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে, যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খামারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণ শেষে সুফলভোগীগণ-

- ছাগল পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও সুবিধা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ছাগলের পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবেন;
- উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল নির্বাচন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রজনন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- গর্ভাবস্থা, দুগ্ধবতী ছাগী ও নবজাতক বাচ্চার যত্ন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন বয়সের ছাগলের সুষম খাদ্য তালিকা তৈরী করতে পারবেন;
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন ।

❖ প্রশিক্ষণ কালে করণীয় ও বর্জনীয়

১। সঠিক সময়ে ক্লাশে উপস্থিত হওয়া।
২। ক্লাশে আন্তরিক পরিবেশ বজায় রাখা।
৩। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
৪। পাশাপাশি কথা না বলা।
৫। এক সঙ্গে সবাই বা একাধিক জনে কথা না বলা।
৬। কোন বিষয় না বুঝলে অবশ্যই তা প্রশ্ন করে জেনে নেয়া।
৭। কেউ প্রশ্ন করতে চাইলে তাতে বাঁধা না দেয়া।

সেসন-০২ ঃ

আইডিএফ পরিচিতি ঃ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন “আইডিএফ” গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মস এর সোসাইটিজ ACT XXI OF ১৮৬০ এর অধীনে রেজিষ্ট্রিকৃত এস-১৫৫১(১১১)/৯৩ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও আইডিএফ বাংলাদেশ সরকারের এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নম্বর ঃ ৯৪১,তারিখ ২৮/০৫/১৯৯৫ইং) এবং মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (সনদ নংঃ-০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯,তারিখ-১৪/০৫/২০০৮ইং) তে নিবন্ধন প্রাপ্ত। বিনা জামানতে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগণকে ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে মুক্ত করতেই এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে আইডিএফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মকান্ড শুরু হয় ১৯৯৩ থেকে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেনিটেশন, বিশুদ্ধ পানি, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরণ, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ভিক্ষুক কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা,রাজশাহী, নাটোর, গাজীপুরসহ মোট ১৩ টি জেলায় ৭৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে অত্র সংস্থা ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক

ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরন, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ডিগনিটি কর্মসূচী পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতাধীন জেলা ছাড়াও সৌরশক্তি কর্মসূচী ফেনী, নোয়াখালী, চান্দপুর, কুমিল্লা জেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে ।

আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জহিরুল আলম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা কালেই গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় চাকুরী শেষে ১৯৯২ সালে দেশে ফিরে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ শুরু করেন। নোবেল বিজয়ী ড ঃ মোহাম্মদ ইউনূস, তাঁর সহকর্মী, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীগণ এ সময়ে তাঁকে এ কাজে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগান। ১৯৯৩ সালে গ্রামীণ ট্রাস্টের সহযোগীতায় বান্দরবান জেলার সুয়ালক মৌজায় “সুয়ালক শাখা” শাখার মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

সেসন ঃ ০৩

- ছাগল পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব
- দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে ছাগল পালনের প্রভাব

ছাগল পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ

- গরীবের গাভী
- বছরে অনেক বাচ্চা উৎপাদন
- মাংস উৎপাদন
- ছাগলের দুধ পুষ্টিকর
- ছাগল পালনে কম পুঁজি স্বল্প ব্যয়
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- অর্থনৈতিক মুক্তি
- রোগ ব্যাধি কম
- ছাগল পালনে ঝুঁকি কম
- বাজারজাতকরণ সুবিধা
- বৈদেশিক মুদ্রা আয় (চামড়া)

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে ছাগল পালনের প্রভাব ঃ

ছাগল বাংলাদেশে অতিপরিচিত গৃহপালিত পশু। দেশের প্রায় ৯৩% ছাগল ক্ষুদ্র, দরিদ্র এবং ভূমিহীন কৃষক পরিবারে পালিত হয়ে থাকে। ছাগল শুধু মাত্র গরীবের সম্পদ। আয় বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ছাগল পালনের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ছাগল পালনে স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন হওয়ায় ঝুঁকিও কম। ছাগল পালনে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হয়না। এদের রোগব্যাধিও কম। অল্প সময়ে বিক্রয় উপযোগী হয়। ছাগলের মাংস সুস্বাদু, কোমল, পুষ্টিকর ও সকলের কাছে অতি প্রিয়। সে কারণে ছাগল বাজারজাতকরণ সহজ। গ্রামের হাট বাজারে অনায়াসে বিক্রয় করে টাকা পাওয়া সম্ভব বলে একে ব্যাংক একাউন্ট বলা যেতে পারে। ছাগল থেকে কিছু পরিমাণ দুধও পাওয়া যায়। গরীব প্রতিপালনকারী পরিবারের সদস্যগণই তা পান করে থাকেন। অথচ গাভী পালন করে দুধ খাওয়ার উপায় তাদের নাই।তাই ছাগলকে গরীবের গাভী বলা হয়। ছাগলের দুধ পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য। ছাগলের দুধের চর্বির পরিমাণ মাতৃদুগ্ধের অনেকটা কাছাকাছি বলে শিশুদের জন্য সহজে হজমযোগ্য। বাংলাদেশের ছাগলের চামড়ার মান অত্যন্ত উন্নত বিধায় মাংসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি চামড়া রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

ছাগলের জন্য গরু-মহিষের মতো চারণভূমির তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। ক্ষেতের আইলে, রাস্তার ধারে, বাড়ির আশ-পাশের ঘাস, লতা, পাতা খেয়ে এরা জীবন ধারণ করতে পারে। ছাগলের জন্য গরু- মহিষের মত অধিক খাদ্য, উন্নত বাসস্থান বা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। ফলে অল্প পুঁজিতে অল্প জায়গায় কয়েকটি ছাগল পালন করা যায়। তাই গরীব বিশেষ করে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী, যুবক যুবতী, দুস্থ মহিলারা গাভী ক্রয় করতে পারে না বলে ছাগল পালন সুবিধাজনক। ছাগল শান্ত স্বভাবের হওয়ায় বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ছাগল পালনে সহযোগীতা করতে পারে। ছাগলের বিষ্ঠা উৎকৃষ্ট সার যা বাড়ীর আঙ্গিনায় শাক-সবজি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে রাসায়নিক সারের খরচ সাশ্রয় হয়।

সেসন-০৪

- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য
- ছাগলের উৎপাদন ক্ষমতা

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলঃ

বাংলাদেশে গরু, মহিষ, ভেড়া, হাঁস-মুরগীর উল্লেখযোগ্য সুনির্দিষ্ট কোন জাত বা ব্রীড না থাকলেও ছাগলের একটি উল্লেখযোগ্য জাত রয়েছে যার নাম ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। বাংলাদেশের সর্বত্র এ ছাগল পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গেও এই ছাগল দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

আকারে ছোট, গায়ের রং সাধারণত কালো। তবে সাদা, খয়েরী, সাদা কালো, খয়েরী কালো, খয়েরী সাদা ছাগলও দেখা যায়। এদের কান ছোট, পাঁঠা এবং ছাগী উভয়ের দাড়ি থাকে। পাঁঠার ওজন ২৫ - ৪০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ২০ - ৪০ কেজি।

দুধ ঃ

দৈনিক সাধারণত ২০০-৩০০ গ্রাম দুধ দেয় তবে ভাল ব্যবস্থাপনায় অনেক ছাগী ১-১.৫ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়। একাধারে ৬০ - ৯০ দিন পর্যন্ত দুধ দেয়।

বাচ্চা উৎপাদন ঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল দ্রুত বংশ বিস্তার ঘটাতে পারে। স্ত্রী ছাগল ৯-১০ মাস বয়সে প্রজননের জন্য প্রথম যোগ্য হয় এবং ১৪-১৫ মাস বয়সে প্রথম বাচচা প্রসব করে থাকে। ভাল ব্যবস্থাপনায় বছরে দু'বার এবং প্রতিবার ৩টি থেকে ৪টি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে থাকে। এরা দেশীয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রধাণত মাংস ও চামড়া উৎপাদনকারী জাত হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃত। ছাগল পালনের মাধ্যমে একজন ভূমিহীন বা প্রান্তিক কৃষক সহজেই বাড়তি আয় করতে পারেন।

মাংসঃ

এ জাতের ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয়।

চামড়া ঃ

বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস যেমন সুস্বাদু, চামড়া তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে উন্নতমানের বলে স্বীকৃত।এদের চামড়ার মান উন্নত বিধায় বিশ্বব্যাপী চাহিদা রয়েছে।

সেসন-৫ ঃ

- বংশ বিবরণের ভিত্তিতে ছাগল বাছাই,
- প্রজনন ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপ্রজনন রোধ

বংশ বিবরণের ভিত্তিতে ছাগল বাছাই ঃ

আমাদের দেশের ছাগল প্রতিপালনকারীগণ বংশ বিবরণ সংরক্ষণ করেন না বিধায় বংশ বিবরণ পাওয়া দুরূহ। তবুও বিক্রেতার সাথে সাথে আলোচনা করে একটি ছাগী বা পাঁঠার বংশের উৎপাদন দক্ষতা সম্বন্ধে ধারণা নেয়া যেতে পারে।

একসাথে ৪ টি বাচ্চা প্রসবকারী ছাগলের বংশ

ছাগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

- ছাগীর বংশ ইতিহাস বিশেষ করে বাচ্চা দেয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী বা নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা দিতে হবে এবং প্রতিবারে ৩-৪টি বাচ্চা দিতে হবে।
- ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হবে।
- ছাগীর মা, দাদী ও নানীকে দৈনিক কমপক্ষে ৬০০-৭০০ মি.লি. দুধ দিতে হবে।
- নির্বাচিত ছাগী তুলনামূলকভাবে লম্বাটে, পা খাটো কিন্তু সমান্তরালভাবে সাজানো হবে।
- ছাগীর ওলান সুগঠিত, বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কিছুটা ভিতরের দিকে বাঁকানো এবং দুধের শিরা সহজেই দেখা যাবে।
- ছাগীর পেট তুলনামূলকভাবে বড়, পাঁজরের হাড় চওড়া, প্রসারিত, দুইটি হাড়ের মাঝখানে কমপক্ষে এক আঙ্গুল ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- ছাগীর বুক চওড়া হবে যাতে সামনের দু'পা সামঞ্জস্যপূর্ণ দূরত্বে থাকে।
- রোগমুক্ত সুস্থ সবল ছাগী নির্বাচন করতে হবে।

পাঁঠা নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

ছাগলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রজনন কার্যে ব্যবহৃত পাঁঠার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই পাঁঠা নির্বাচনে পাঁঠা নির্বাচনের সময় নিম্নে উল্লেখিত গুণাবলিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে ঃ

- পাঁঠা নির্বাচনের সময় পাঁঠার বয়স ১২ মাসের মধ্যে হতে হবে ।
- অন্ডকোষের আকার বড় এবং সুগঠিত হতে হবে।
- পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী দেখে নির্বাচন করতে হবে।
- পাঁঠার বংশ ইতিহাস বিশেষ করে তার মা, নানী, দাদীর বাচ্চা দেয়ার ক্ষমতা সমন্ধে জানা প্রয়োজন। অধিক উৎপাদনশীল বংশের অর্থাৎ পাঁঠার মা, দাদী ও নানী বছরে ২ বার বাচ্চা দিয়েছে এবং প্রতিবারে ৩-৪টি বাচ্চা দিয়েছে এরুপ বংশের আকারে বড় ও শৌর্য্য বীর্যের অধিকারী পাঁঠা বাছাই করতে হবে ।
- পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হওয়া উচিত।
- পাঁঠার মা, দাদী ও নানী দৈনিক কমপক্ষে ৬০০-৭০০ মিলিলিটার দুধ দেওয়া উচিত।
- পাঁঠা যৌন রোগসহ অন্যান্য রোগ মুক্ত হওয়া উচিত।

প্রজনন ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপ্রজনন রোধ ঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের উৎপাদন বৈশিষ্ট সকলের এক রকম নয়। কোন কোনটি ১- ২টি বাচ্চা দেয় আবার কোন কোনটি একসাথে ৩-৪টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। ১২-১৪ মাস বয়সেই বাচ্চা প্রসব শুরু করে। এরা বছরে ২ বার পর্যন্ত বাচ্চা দেয় তবে অনেকেই দু'বছরে তিনবার বাচ্চা দেয়। ছাগল পালনকারীদের জন্য ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যত বেশি সংখ্যক সুস্থ্য সবল বাচ্চা পাওয়া যাবে তত বেশী লাভবান হওয়া যাবে। সুস্থ সবল বেশি সংখ্যক বাচ্চা পাওয়ার উপরই ছাগল পালনের লাভ-লোকসান নির্ভর করে। এক সাথে কতগুলো বাচ্চা প্রসব করবে তা নির্ভর করে তার বংশ বৈশিষ্ট্যের উপর। যে মা ৩/৪টি বাচ্চা একসাথে প্রসব করে তার সন্তানদের মাঝেও সে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে। অর্থাৎ তার বাচ্চা যখন বড় হয়ে মা হবে তখন সেও ৩/৪ টা বাচ্চা একসাথে প্রসব করবে (যদি পাঁঠাও সেরকম বৈশিষ্ট্য ধারণ করে)। এছাড়াও কিছু কিছু ছাগী পাওয়া যায় যারা ১-১.৫ লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। এরকম বিরল বৈশিষ্ট সম্পন্ন বাচ্চাগুলোকে চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পুরুষ বাচ্চা বড় করে খাসী করা উচিৎ হবে না। এদেরকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করতে হবে। এভাবে বংশ বিবরণের ভিত্তিতে বাছাই করে ভাল বৈশিষ্টের বাচ্চা পালন করলে সেখান থেকে একটা ভাল জাত তৈরী করা যাবে।

তবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেন ভাই-বোন, বাপ-মেয়ে বা নিকট আত্মীয় পাঁঠা ও পাঁঠীর মাঝে প্রজনন না হয়। এভাবে আন্তঃপ্রজননের (inbreeding) মাধ্যমে উৎপাদিত বাচ্চার উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে, উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হতে থাকবে, রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যুহার বেড়ে যাবে।

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনাঃ

পাঁঠী বাচ্চা বড় হয়ে একসময় যৌবনপ্রাপ্ত হলে ডাক আসবে। কিন্ত প্রথম অবস্থাই পাঁঠীর নিজের শরীর বৃদ্ধি অব্যহত থাকে। তাই প্রথমেই পাল দিলে সে গর্ভধারণ করবে তবে এসময় সে যে খাবার খাবে তার দুই ভাবে ব্যয় হবে। একভাগ গর্ভের বাচ্চা বৃদ্ধির জন্য এবং অপরভাগ নিজের শরীর বৃদ্ধির জন্য ব্যয় হবে ফলে উভয় বৃদ্ধিই ব্যহত হবে। ফলশ্রুতিতে সে নিজে যেমন ছোট আকৃতির ও দুর্বল থাকবে তেমনি তার গর্ভের বাচ্চাও ছোট আকৃতির ও দূর্বল হয়ে এসব বাচ্চার মৃত্যু হার বেড়ে যাবে।

তাই প্রথম পাল দেয়ার ক্ষেত্রে বয়সের চেয়ে ওজনের বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। তখনই একটি পাঁঠী ছাগলকে পাল/প্রজনন করা যাবে যখন এর ওজন হবে একটা পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ চার ভাগের তিন ভাগ। ফলে, ভাল পুষ্টি সম্পন্ন খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও যত্নের মাধ্যমে পরবর্তীতে সে নিজে পূর্ণ ওজনে পৌঁছাতে পারবে। ছাগল ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে সে নিয়মিতভাবে গরম হবেনা ফলে গর্ভধারণ দেরীতে হতে থাকবে এবং দুই গর্ভকালের মধ্যে সময় বেশী লাগবে। সর্বোপরি তার জীবনকালে মোট বাচ্চা উৎপাদনের পরিমান কম হবে। বাড়ন্ত পাঁঠী জন্মের ৬-৭ মাসের মধ্যে গরম হতে পারে। তবে পাঁঠীর স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে ওজন ১২-১৩ কেজি হওয়ার আগে পাল না দিয়ে অপেক্ষা করা প্রয়োজন। সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সাধারণ ১২ মাস বয়সে ছাগলকে পাল দেওয়া যায়।

দুগ্ধবতী ছাগল

প্রজননের জন্য পাঁঠা ব্যবস্থাপনাঃ

ছবি ঃ পাঁঠা

পূরুষ বাচ্চা সাধারণতঃ ৩/৪ মাস বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয়ে পাঁঠায় পরিণত হয়। কিন্তু আট/নয় মাস বয়সের পূর্বে পাল দেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কোন পাঁঠার শারীরিক দুর্বলতা, পঙ্গুত্ব বা কোন যৌন অসুখ সমস্ত পালকে নষ্ট করে দিতে পারে। এসময় দেখতে হবে তার দুটো অন্ডকোষই সমান ভাবে নেমেছে কিনা নচেৎ বীর্য উৎপাদন পর্যাপ্ত হবেনা। একটা পাঠা ১০-২০টি পাঁঠী ছাগলকে প্রজনন করতে পারে। কম বয়স্ক পাঁঠাকে বেশী সংখ্যক পাঠী প্রজননে ব্যবহার করা উচিত নয় এতে করে প্রজননের গুণগত মান কমে যাবে। পাঁঠা সুস্থ্য সবল হওয়া দরকার তবে বেশী মেদ বিশিষ্ট পাঠা প্রজননের গুণগত মানের জন্য ভাল নয়।

যে সব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত করা হবে না, তাদেরকে জন্মের ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করানো উচিত। পাঁঠাকে যখন প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয় না তখন তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুধু ঘাস খাওয়ালেই চলে। তবে প্রজনন কাজে ব্যবহারের সময় ওজন ভেদে ঘাসের সাথে ২০০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে। পাঁঠাকে প্রজননক্ষম রাখার জন্য প্রতিদিন পাঁঠাকে ১০ গ্রাম পরিমাণ গাঁজানো ছোলা দেয়া উচিত। পাঁঠাকে কখনই চর্বিযুক্ত হতে দেয়া যাবে না।

একটি পাঁঠা ১০ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে।

শিং ছাড়া পূরুষ ছাগল (hornless male)ঃ

মাঝে মধ্যে কিছু পাঁঠা পাওয়া যায়। এদের শিং নাই। এ ধরনের পাঁঠা দেখতে পূরুষ ছাগলের মত দেখালেও এরা প্রকৃত পক্ষে প্রজননের উপযোগী নয়।

গরম হওয়ার লক্ষণ সমুহ ঃ

একটি সুস্থ্য, যৌবনপ্রাপ্ত পাঁঠী গর্ভবতী হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতি ১৭-২১ দিন পর পর ডাক আসবে। ডাক আসার বিষয়টি অনেক সময় বংশ বৈশিষ্ট্য ও পুষ্টির উপর নির্ভর করে। নিয়মিত ভাবে পরিমিত খাদ্য না পেলে ও অপুষ্টি জনিত কারণে নিয়মিত ডাক আসেনা। ছাগল প্রতিপালনকারী বাচ্চা পালনের সুবিধা অসুবিধা এবং বাচ্চা পালনের সময় খাদ্য প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনা করে পাঁঠীকে পাল দেবার সময় নির্ধারণ করতে পারেন।

পাঁঠী বা ছাগী গরম হওয়ার ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে পাল দিতে হয়। অর্থ্যাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।

গরম হওয়ার সময় নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাবেঃ

- ভ্যা ভ্যা করা
- বিরামহীন অবস্থা
- অপর ছাগলের উপর লাফিয়ে উঠা
- যোনীপথ কিছুটা লাল এবং ফোলা
- যোনীদ্বারে পরিস্কার নারিকেল তেলের মত পদার্থ বের হবে
- পাঠাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রস্রাব করা
- পাঠার কাছে যাবার প্রবণতা।

গর্ভধারণ সময় কালঃ

ছাগলের গর্ভধারণ কাল ১৪৫-১৫০ $\pm$ ৫ দিন। এসময় গর্ভবতী ছাগলকে সর্বপ্রকার উপদ্রব মুক্ত রাখা প্রয়োজন। গর্ভধারণ কালের শেষ ৬ সপ্তাহ গর্ভবতী মাকে প্রচুর প্রোটিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হবে।

প্রসবের ৮ সপ্তাহ পূর্ব থেকে দুধ দোহন বন্ধ করতে হবে। বাচ্চাকে দুধ ছাড়াতে হবে, যদি গর্ভবতী ছাগলের নিজের পুষ্টি বজায় থাকে তাহলে পেটের বাচ্চা সুস্থ থাকবে এবং প্রসবের পর প্রচুর দুধ উৎপাদনে সক্ষম হবে।

সেসন ঃ ০৬

গর্ভকালীন ও গর্ভপরবর্তী ছাগী ও ছাগলের বাচ্চার যত্ন ঃ

গর্ভাবস্থায় যত্নঃ

গর্ভাবস্থায় শেষ দুই মাসে গর্ভস্থ বাচ্চা দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ সময় ছাগীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও গর্ভস্থ বাচ্চার স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যহত রাখার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য ও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। সেজন্য গর্ভাবস্থায় শেষ দুই মাস ছাগীকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। তেমনি ছাগীর নিরাপদ ও পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। গর্ভাবস্থায় শেষ পর্যায়ে গর্ভবতী ছাগলকে আলাদাভাবে পালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এক সাথে ঠেলাঠেলি করে ঘরের দরজা দিয়ে বের হওয়া, উঁচু মাচায় উঠা ইত্যাদি সময় গর্ভবতী ছাগী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ওলান ও যোনীপথের উপরিভাগ ফুলে উঠার মাঝে বাচ্চা প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

- বাচ্চা প্রসবের ২-৩ দিন পূর্বে ছাগীর ওলান ও যোনিমুখ ফুলে যায়। এ সময় ছাগীকে বাচ্চা প্রসবের জন্য আলাদা ঘরে রাখতে হবে। প্রসবের ঘর পরিস্কার, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, খড়ের ভাল বিছানা ও ঘর জীবাণু মুক্ত করতে হবে।
- বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিক নজরে রাখতে হবে।
- প্রসবের সময় কোন প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা বা জটিলতা দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের পর কুসুম কুসুম গরম পানিতে সামান্য পটাশ মিশিয়ে যৌনাঙ্গ, দেহের পশ্চাদাংশ ও লেজ ভালভাবে পরিস্কার করে দিতে হবে।
- ছাগীর যেন ঠান্ডা না লাগে সে দিকে নজর দিতে হবে।
- ছাগীকে প্রসবের পর অল্প গরম পানি বা অল্প গরম পানিতে গুড় মিশিয়ে শরবত খাওয়ানো যায়
- ছাগীর প্রসবের ২-৪ ঘন্টার মধ্যে ফুল পড়ে যাবার কথা। কিন্তু প্রসবের ৮-১০ ঘন্টার মধ্যে যদি ফুল না পড়ে তবে পশু চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
- ছাগীকে কিছুটা গরম পানিতে গমের ভুষি চুবিয়ে খাওয়ানো ভাল। এছাড়া কিছু সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে।

দুগ্ধবতী ছাগীর যত্নঃ

দুগ্ধবতী ছাগীর উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যা না হলে দুধ উৎপাদন কমে যায়, নানান রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। তাই ছাগী ও বাচ্চার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত যত্নের প্রয়োজন হয়।

- ছাগীর দুধ উৎপাদন খাদ্যের উপর নির্ভর করে। তাই পরিমিত পরিমানে সুষম খাদ্য প্রতিদিন খাওয়াতে হবে। খাদ্যের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।
- মাচার উপর খড় বিছিয়ে ছাগীর আরামদায়ক শোয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।
- নিয়মিত শরীর পরিস্কার ও গোসল করাতে হবে।
- ঘরে/মাচার নিচে যাতে বিষ্ঠা ও মূত্র জমে অ্যামোনিয়া গ্যাস সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ছাগলের বাচ্চার যত্নঃ

নবজাতক ছাগলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না এবং সহজেই রোগাক্রান্ত হতে পারে। উপযুক্ত যত্নের অভাবে ছানার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে তাই বাচ্চার নিম্নোক্ত যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

- প্রসবের পরপরই বাচ্চার নাক ও মুখের লালা ও ঝিল্লি পরিস্কার করে দিতে হবে। অন্যথায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যেতে পারে। যদি প্রসব হওয়ার পর শ্বাস-প্রশ্বাস না নেয় তাহলে বাচ্চার বুকের পাঁজরের হাড়ে আস্তে আস্তে কয়েক বার চাপ দিতে হবে। বাচ্চার নাক, মুখে ফুঁ দিয়েও শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করা যায়।

- বাচ্চার নাক মুখ পরিস্কারের পর ছাগীর সামনে শুকনো খড় বিছিয়ে তার উপর রাখলে মা চেটে চেটে বাচ্চার গা পরিস্কার করে দেয়। কোন অবস্থাতেই নবজাতক বাচ্চার গায়ে পানি দেওয়া যাবে না। কারণ এটি বাচ্চার মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

- শীতকাল ছাগলের বাচ্চার সবচেয়ে বিপদজনক সময়। শীত বা অতিরিক্ত ঠান্ডায় শুকনো কাপড় বা চট দিয়ে বাচ্চাকে ডেকে রাখতে হবে অথবা পাশে আগুন জ্বালিয়ে বাচ্চার গা গরম করার ব্যবস্থা করতে হবে।

- বাচ্চার নাভি দেহ থেকে ২ ইঞ্চি বাড়তি রেখে পরিস্কার জীবাণুমুক্ত কাচি দিয়ে কেটে গিট দিয়ে দিতে হবে। কাটার পর আয়োডিন লাগাতে হবে। যাতে নাভির কর্ড দিয়ে রোগ জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে।

- সুস্থ সবল বাচ্চা প্রসবের একটু পরেই ওঠার চেষ্টা করে ও দুধ খাওয়া শুরু করে। অনেক সময় বাচ্চা নিজের চেষ্টায় দাঁড়াতে ও দুধ খেতে পারে না। ফলে তাকে দাঁড়াতে ও দুধ খেতে সাহায্য করতে হয়। যদি বাচ্চার দুর্বলতার কারণে দাঁড়াতে ও দুধ খেতে না পারে তবে বোতলে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

- নবজাতক বাচ্চার প্রথম খাবার হিসেবে শাল দুধ খাওয়াতে হবে। কারণ স্বাভাবিক দুধের চেয়ে শাল দুধে ৩-৫ গুণ অধিক আমিষ থাকে।

খোঁজা/খাসীকরণঃ

বাচ্চাকে খাসী করণের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করতে হবেঃ

- সাধারণত ছাগলের পুং ও স্ত্রী বাচ্চার অনুপাত ১ঃ১। ভাল উৎপাদনশীল ছাগী ও পাঁঠার মাধ্যমে প্রাপ্ত বাচ্চাকে খাসী না করিয়ে বরং তা প্রজনন কাজে ব্যবহার করা উচিত।
- কম উৎপাদনশীল বংশের বাচ্চার বয়স যখন ২-৩ সপ্তাহ তখন তাকে খাসী করানো উচিত।

সেসন -৭ ঃ

- ছাগলের সুষম খাদ্য পরিচিতি
- সম্পূরক খাদ্য
- দানাদার খাবার

ছাগলের সুষম খাদ্য পরিচিতি ঃ

ছাগল ভালজাতের পাশাপাশি পরিমিত পরিমান বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানের সমন্বয়ে সুষম খাদ্যের দিকে নজর দিতে হবে। খাদ্য সুষম না হলে সুস্বাস্থ্য ও পর্যাপ্ত উৎপাদন পাওয়া যাবেনা। সাধারণ মানের ঘাস ও গাছের পাতা থেকে দেহের প্রায় সকল প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা ছাগলের রয়েছে। তবে খাদ্যের পুষ্টিমান কম হলে ছাগল পুষ্টিহীনতার শিকার হবে। ছাগল প্রকৃতি

প্রদত্ত গুণ হিসেবে খাদ্যমানের অবস্থাভেদে গৃহীত খাদ্যের পরিমান কমবেশি করতে পারে এবং সাধারণ খাদ্য থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি মিটাতে সক্ষম। অধিক উৎপাদনশীল জাতের ছাগলের ক্ষেত্রে সম্পূরক দানাদার খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ছাগল সাধারণত নিজের ওজনের ৫-৬% হারে শুষ্ক খাদ্য খেয়ে থাকে। বাংলাদেশ ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ ছাগলকে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে খাওয়ানো হয়।

একটি পূর্ণবয়স্ক ছাগীর গড় ওজন ৩০ কেজি হলে দৈনিক ১.৫-১.৮ কেজি শুষ্ক পদার্থ প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ১-১.৫ কেজি পরিমাণ শুষ্ক পদার্থ ঘাস থেকে অর্থাৎ ৩-৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং বাকী ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য থেকে দেয়া উচিত। একটি ছাগী বাচ্চা দেয়ার দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয় সেজন্য প্রায় একই পরিমাণের খাবার গর্ভাবস্থায়ও ছাগলকে খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়। এই হারে খাওয়ালে ছাগল-

- দৈনিক ৪০০-১০০০ গ্রাম পর্যন্ত দুধ ও বছরে দুই বার বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চা দেয়ার গড়ে ২১ দিনের মাথায় পুনরায় গরম হয়।
- জন্মের সময় বাচ্চার ওজন ১-১.৫ কেজি হয় এবং বাচ্চার মৃত্যুর হার কমে যায়।

গর্ভকালীন সময়ে ছাগল/ভেড়াকে পরিমিত পরিমান খাদ্য খাওয়ানো হলে মা ও বাচ্চা উভয়েরই স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

- এ সময় ছাগল/ভেড়াকে ভাল ঘাস যুক্ত মাঠ, রাস্তার ধার, পুকুরের পাড়, জমির আইল ইত্যাদি স্থানে বেধেঁ অথবা ছেড়ে ২ ঘন্টা চড়ানো যেতে পারে।
- চারণ ভুমিতে ঘাসের পরিমাণ কম হলে প্রতিটি ছাগল/ভেড়াকে প্রতিদিন ১ কেজি পরিমাণ কাঠালের পাতা, জিকা পাতা, বাদীপাতা, মান্দার গাছের পাতা, তেলী কদম গাছের পাতা, কেওড়া পাতা, বাবলা পাতা ইত্যাদি দিতে হবে।
- গর্ভবতী/দুগ্ধবতী ছাগী/ভেড়ীকে প্রতিদিন ২৫০ গ্রাম ভাতের মাড় দেওয়া যেতে পারে। গর্ভবতী/দুগ্ধবতী ছাগী/ভেড়ীকে প্রতিদিন ৩০০ গ্রাম হারে দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

১০ কেজি দানাদার খাদ্য প্রস্তুতিঃ

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমান
১	গমের ভুষি	৪ কেজি
২	চালের কুড়া	২ কেজি
৩	ডালের ভুষি	১.৫ কেজি
৪	খৈল	২ কেজি
৫	লবণ	২০০ গ্রাম
৬	ঝিনুকের গুড়া	৩০০ গ্রাম
মোট		১০.০০ কেজি

উক্ত থেকে ৩০০ গ্রাম হারে প্রতিটি গর্ভবতী ছাগল/ভেড়াকে প্রতিদিন খাওয়াতে হবে। সাথে ৩ কেজি পরিমান কাঁচা ঘাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

গর্ভবতী ছাগীর খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল সাধারণত ২-৪ টি বাচ্চা দেয় । এ জন্য গর্ভবতী ছাগী/ভেড়ীকে পর্যাপ্ত পরিমানে পুষ্টি সম্পন্ন খাদ্য না খাওয়ালে বাচ্চার আকার ছোট ও দূর্বল হয়, বাচ্চার মৃত্যুর হার বেড়ে যায়, মায়ের দুধ উৎপাদন কমে যায় এবং দেরীতে পুনঃপ্রজনন হয়। সাধারণত গর্ভের ১ম ৩ মাস যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা গর্ভস্থ্ ভ্রুনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। আবার গর্ভকালের শেষ মাসে দ্বিগুণ পরিমান শক্তি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
ভাতের চাল ধোয়া পানি দেয়া যায়।

বাচ্চার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

জন্মের পরপরই বাচ্চাকে পরিস্কার করে শুকনো করে নিয়ে মায়ের শাল দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে। শাল দুধই বাচ্চার প্রথম খাবার। শাল দুধ বাচ্চাকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগানের সাথে সাথে ও দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এক মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে দিনে ৪-৫ বার দুধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চার চাহিদার তুলনায় মা'য়ের কম দুধ থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগী বা

গাভী থেকে দুধ সংগ্রহ করে খাওয়াতে হবে। দুধ খাওয়ানোর আগে ফিডার, নিপলসহ আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র পানিতে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। তবে পরিস্কার পাত্রে খাওয়ানোই উত্তম। ১-১.৫ কেজি ওজনের একটি ছাগল ছানার জন্য দৈনিক ২৫০-৩০০ মিলি লিটার দুধ প্রয়োজন। বাচ্চা যেন অতিরিক্ত দুধ না খায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বাচ্চার বয়স ৬০-৯০ দিন হলে দুধ ছেড়ে দেবে। সাধারণত মা ছাগলকে চাহিদা মতো খাবার দিলে বাচ্চার প্রয়োজনীয় দুধ উৎপাদন হয়।

২য় সপ্তাহ বয়স থেকে ছাগল/ভেড়ার বাচ্চাকে সামান্য পরিমান কচি কাচা ঘাস দেয়া শুরু করতে হবে। যদি ছাগী/ভেড়ীর দুধ পর্যাপ্ত না হয় তা হলে গরুর দুধ বিকল্প হিসাবে বোতলে বা থালায় খাওয়াতে হবে। যে বাচ্চাটি তুলনামুলকভাবে দুর্বল তাকে ধরে আগে খাওয়াতে হবে তারপর অন্যগুলোকে খাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। বাচ্চার বয়স যখন ৬ সপ্তাহ তবে তখন কিছু দানাদার খাবার দিনে ১০-২০ গ্রাম করে খাওয়ানো যেতে পারে। ৩ মাস পর বাচ্চাকে সম্পূর্ণরুপে ঘাসের খাওয়ানোর উপর নির্ভর করাতে হবে এবং দুধ ছাড়াতে হবে। তবে এর আগেও দুধ ছাড়ানো যায়।

একটি দেড় কেজি ওজনের দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চার প্রথম মাসে গড়ে দৈনিক ২০০-৩০০ গ্রাম দ্বিতীয় মাসে ৩০০-৪০০ গ্রাম এবং তৃতীয় মাসে ৪৫০-৬০০ গ্রাম দুধের প্রয়োজন হয়। এই পরিমান দুধ পেতে হলে মা'কে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য দেয়া প্রয়োজন। বয়স ও ওজনভেদে ছাগলের বাচ্চার প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং খাদ্যের পরিমাণ নিম্নরুপঃ

বয়স	ওজন	দৈনিক খাদ্য (গ্রাম)			
(সপ্তাহ)	(কেজি)	দুধ	দানাদার খাদ্য	কাঁচা ঘাস	ইউএমএস প্রক্রিয়াজাত খড়
০	১.৫	২৯০			
১	২.০	৩৬০			
২	২.৪	৪১০	১০	সামান্য পরিমান	
৩	২.৮	৪৬০	১০	সামান্য পরিমান	
৪	৩.১	৫০০	১০	সামান্য পরিমান	
৫	৩.৬	৫৬০	২০	সামান্য পরিমান	
৬	৪.০	৬০০	২০	১০০	সামান্য পরিমাণ (১০ গ্রাম)
৭	৪.৪	৬০০	৩০	১০০	ঐ
৮	৪.৭	৬০০	৩০	১০০	ঐ
৯	৫.০	৬০০	৩০	১৫০	ঐ
১০	৫.৪	৫৫০	৫০	১৫০	৩০
১১	৫.৭	৫০০	৭০	১৫০	৩০
১২	৬.১	৪৫০	৯০	১৭৫	৩০
১৩	৬.৯৬	২০০	১৫০	২০০	৪০
১৪	৭.৩৮	১০০	২০০	৩০০	৫০
১৫	৭.৮০	-	২৫০	৪০০	৭০
১৬	৮.৫০	-	২৫০	৫০০	১০০

দেশী ছাগলের সাধানত দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ায় (উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় সাধারণত দৈনিক গড়ে ৫০০ গ্রাম দুধ দিতে পারে) ২-৪টি বাচ্চা বিশিষ্ট ছাগীর দুধ প্রায়ই বাচ্চার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়না। এক্ষেত্রে বাচ্চাকে উল্লেখিত পরিমাণে গরুর দুধ ৩৯-৪০$^{\circ}$ সে. তাপমাত্রায় বোতলে বা পরিস্কার পাত্রে খাওয়াতে হবে।

বোতলে দুধ খাওয়ানোর সাবধানতা-

- দুধ খাওয়ানোর আগে ফিডার, নিপলসহ আনুসঙ্গিক জিনিস ফুটন্ত পানিতে রেখে জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- কখনোই ঠান্ডা বা বাসী দুধ খাওয়ানো যাবে না।
- যিনি দুধ খাওয়াবেন তার হাত সাবান দিয়ে পরিস্কার করে নিবেন।

ছাগলের বাচ্চা জন্মের ২য় সপ্তাহ থেকেই ধীরে ধীরে ছাগলের বাচ্চাকে অল্প অল্প করে দানাদার খাদ্যে অভ্যস্থ করতে হবে। জন্মের ১৫-২০ দিন পর থেকেই ছাগলের বাচ্চাকে আঁশ জাতীয় খাবার যেমন কাঁচা ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্থ করে তুলতে হবে। সাধারণত দানাদার খাদ্য খাওয়ানো শেষে ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমান পানি খাওয়াতে হয়। একটি বাড়ন্ত

ছাগল দৈনিক ০.৫- ০.৭ লিটার পানি পান করতে পারে। তবে কাঁচা ঘাস বেশী পরিমাণ খাওয়ালে পানির পরিমাণ কম প্রয়োজন হয়। পানি খাওয়ানোর পর ইউএমএস বা ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় এবং কাঁচা ঘাস মিশিয়ে বা আলাদাভাবে খাওয়াতে হবে। দানাদার খাদ্যের সাথে ঘাস জাতীয় খাদ্যও খাওয়াতে হবে। শুধুমাত্র দানাদার খাদ্য খাওয়ালে পাকস্থলী ভাল কাজ করবেনা।

বাচ্চার ব্যবস্থাপনাঃ

বাচ্চা বয়সে ডায়রিয়া বাচ্চা মৃত্যুর অন্যতম কারণ। এজন্য বাচ্চাকে সব সময় পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং পরিমাণ মত দুধ খাওয়াতে হবে। ফিডার ও অন্যান্য খাদ্য পাত্র সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১. জন্মের পর পর বাচ্চাকে পরিস্কার করে নাভি থেকে ৩-৪ সে.মি. নিচে কেটে দিতে হবে।
২. যে বাচ্চার মায়ের দুধের পরিমাণ কম তাদেরকে বোতলে অন্য ছাগলের দুধ/বিকল্প দুধ (মিল্ক রিপ্লেসার) খাওয়াতে হবে।
৩. শীতের সময় বাচ্চাকে মায়ের সাথে ব্রুডিং প্যানে রেখে ২৫-২৮° সেঃ তাপমাত্রায় রাখতে হবে।
৪. বাচ্চা যেন অতিরিক্ত দুধ না খায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।
৫. যে সব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে না, তাদেরকে ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করাতে হবে।

পারিবারিকভাবে ছাগল প্রতিপালনকারীর গৃহস্থালী দ্রব্য থেকে তৈরী দানাদার খাদ্য মিশ্রণঃ

উপাদান	শতকরা পরিমাণ(%)
চাল ভাঙ্গা/খুদ	৪০
চালের কুড়া	৫০
ডালের ভূষি	৫
লবণ	৩
ঝিনুকের গুড়া	২
মোট=	১০০

বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

বাড়ন্ত ছাগল/ভেড়ার ক্ষেত্রে ৪-১৪ মাস সময়কাল তাদের বাড়ন্ড় সময় । এ সময় যে সব ছাগল/ভেড়া মাংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাদের খাদ্য পুষ্টি চাহিদা যথাযথ পূরণ করতে হবে। দুধ ছাড়ানো পর থেকে ৫ মাস পর্যন্ত ছাগল/ভেড়ার পুষ্টি সরবরাহ অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে থাকে। তাই এসময়ে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন।

খাদ্যের ধরণঃ

১. **আঁশজাতীয় খাদ্যঃ** ঘাস, গাছের পাতা ইত্যাদি খাদ্যে উচ্চ মাত্রায় আঁশ থাকে পূর্ণ মাত্রায় হজমি উপাদান থাকে তাদের আঁশওয়ালা খাদ্য বলে। আঁশওয়ালা খাদ্যে কম হজমি দ্রব্যই বেশী থাকে। এ শ্রেণীর খাদ্যে শতকরা ১৮ ভাগের অধিক আঁশ থাকে। এছাড়া শক্তিকারক খাদ্য উপাদান খুব অল্প মাত্রায় থাকে।
২. **দানাদার খাদ্যঃ** শষ্য দানা, কৃষি শিল্পের উপজাত, গুড় ইত্যাদি। দানাদার খাদ্য মিশ্রণ সুপাচ্য ও পুষ্টিকর উপাদান (আমিষ, শর্করা, চর্বি) সমৃদ্ধ। এ শ্রেণীর খাদ্যে আদ্রতার পরিমাণ কম থাকে। দুগ্ধবতী গাভী থেকে অধিক দুধ ও ছাগীর/ভেড়ীর গর্ভস্থ বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধির জন্য কাঁচা ঘাসের পাশাপাশি অবশ্যই দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
৩. ভিটামিন, খনিজ পদার্থ।
৪. **পানি** ঃ ৩-৮ লিটার পানি প্রয়োজন

- দুগ্ধবতী ছাগলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি প্রয়োজন
- দিনে নির্দিষ্ট সময় ১বার পানি দিতে হবে এবং এতে করে তার অভ্যাস হয়ে যাবে
- বাকী সময় বেশী পরিমান খাবার খাবে
- পানির তাপমাত্রা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঠান্ডা পানি সরবরাহ করতে হবে এবং মাঝে মাঝে পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে
- বেশী পানি পান করলে খাবার কম খাবে এবং উৎপাদন কম হবে

সেসন-৮

ইউ.এম.এস তৈরী

কাঁচা ঘাস চাষাবাদ ও সরবরাহ

ইউ.এম.এসঃ

কাঁচা ঘাস এর অভাব হলে ছাগলকে ইউরিয়া, চিটাগুড় মেশানো খড় নিম্নোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত করে খাওয়ানো যেতে পারে।

খড় (২-৩ ইঞ্চি) করে কাটা ঘাস	ঃ ১ কেজি
পানি	ঃ $\frac{১}{২}$ লিটার
চিটা গুড়	ঃ ২৫০ গ্রাম
ইউরিয়া	ঃ ৩০ গ্রাম

সবুজ ঘাস উৎপাদন ও সরবরাহ

আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে কাঁচা ঘাসের নিয়মিত সরবারহ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন। কাঁচা ঘাসে প্রচুর পরিমান ভিটামিন বিদ্যমান। এ ভিটামিন ছাগলের হজম প্রতিক্রিয়া, রোগ প্রতিরোধ, উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভুমিকা রাখে।

দিনে দিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে পশুর ঘাসের প্রাকৃতিক উৎস নেই বললেই চলে। এ জন্য ছাগলের খামার স্থাপনেচ্ছু সকল উদ্যোক্তাকেই খামারের গরুর জন্য ঘাসের সরবারহ নিশ্চিত করতে আলাদা ঘাস চাষযোগ্য জমির ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে সরকারী উৎস হতে উন্নত জাতের পুষ্টি বৃদ্ধির অধিক উৎপাদনশীল ঘাসের বীজ কাটিং সরবরাহ পাওয়া যায়।

ছবি ঃ কাঁচা ঘাসের চাষ

এ সকল ঘাসের মধে নেপিয়ার, পারা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মৌসুমভিত্তিক ভুট্টা, শুটি জাতীয় ঘাস, যেমন- মাশকালাই, খেসারী ইত্যাদি চাষ করে ছাগলের ঘাসের অভাব দুর করা যেতে পারে।

দেশীয় পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ

বাংলাদেশে বৃষ্টির মৌসুমে কোন কোন এলাকায় প্রচুর পরিমানে ঘাস পাওয়া যায়। যেমনঃ দূর্বা, আরাইল, সেচি, দশ, শষ্য খেতের আগাছা ইত্যাদি। বৃষ্টির মৌসুমে গো-সম্পদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতিও হয়। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে ঘাসের অভাবে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তাই এ সময়ে উৎপাদিত অধিক পরিমান ঘাসকে সংরক্ষন করে রাখার জন্য বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট দেশীয় পদ্ধতিতে সবুজ ঘাসে সংরক্ষণে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ পদ্ধতিতে গর্তের মর্ধ্যে ঘাস সংরক্ষণ করা হয়।

সংরক্ষণ পদ্ধতি

- প্রথমে শুষ্ক ও উঁচু যায়গা যেখানে পানি জমেনা এরকম স্থনে একটি গর্ত তৈরী করতে হবে।
- গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থের তলায় ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হবে। দৈর্ঘ্যের মাপ নির্ভর করবে ঘাসের পরিমাণের উপর। গর্তটির তলা পাতিলের মত সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে।
- ১০০ সিএফটি একটি মাটির গর্তে ২.৫০ থেকে ৩.০০টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।
- সবুজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে।
- তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ঃ১ অথবা ৪ঃ৩ পরিমান পানি মিশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানো উপযোগী হবে।

ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশানো যাবে।
• গর্তের তলায় পলিথিন দিলে আগে বিছিয়ে নিতে হবে। পলিথিন না দিলে পুরু করে খড় বিছাতে হবে। এরপর দু'পার্শ্বে পলিথিন না দিলে ঘাস সাজানোর সাথে সাথে খড়ের আস্তরণ দিতে হবে।
• এরপর পরতে পরতে সবুজ ঘাস এবং শুকানো খড় দিতে হবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি সবুজ ঘাস এবং১৫ কেজি শুকানো খড় দিতে হবে।
• ৩০০ কেজি ঘাসের পরতে পূর্বের হিসেবে ৯ থেকে ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৮ থেকে ১০ কেজি পানির মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটায়ে দিতে হবে।খড়ের মধ্যে কোন চিটাগুড় দিতে হবে না।
• এভাবে পরতে পরতে ঘাস ও খড় সাজাতে হবে এবং ভালভাবে পাড়িয়ে ভিতরের বাতাস যথাসম্ভব বের করে দিতে হতে।
• এভাবে গর্ত ভর্তি করে মাটি উপরে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। ঘাস সাজানো শেষ হলে খড় দ্বারা পুরু করে আস্তারণ দিয়ে সুন্দর করে মাটি দিতে হবে। সম্পূর্ণ ঘাস একদিনেই সাজানো যায়। তবে বৃষ্টি না থাকলে প্রতিদিন কিছু কিছু করেও কয়েকদিন ব্যাপী সাইলেজ তৈরী করা যায়।

সাবধনতা
- নীচু জায়গায় গর্ত করা যাবে না। তাতে পানি জমে ঘাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- উপরের পলিথিন সুন্দর ভাবে এটে দিতে হবে যাতে কোন পানি ঘাসের ভিতরে প্রবেশ না করে।
- চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমান বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে। বেশী পাতলা হলে ঘাস হতে চইয়ে নীচে চলে যাবে। এমনভাবে দ্রবন তৈরী করতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাবে।
- ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাকা জায়গাগুলো যথাসম্ভাব বন্ধ হয়ে যায়।
- গর্তের কোনাগুলো এবং পাশা সমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে যাতে ফাকা বন্ধ হয়ে যায়।
- ঘাসের সাথে খুব বেশী বৃষ্টির পানি থাকা বাঞ্ছ্য়।

খাদ্য গ্রহণ
এভাবে সংরক্ষিত ঘাস প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০ কেজি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উক্ত বর্ণিত পদ্ধতিতে বর্ষা মৌসুমের প্রাপ্ত ঘাস সংরক্ষণ করলে শুষ্ক মৌসুমে গো-খাদ্যের অভাবে কিছুটা হলেও সমাধান হবে। ঘাস সংরক্ষণের এ প্রযুক্তিটি ব্যবহারে দেশের গো-খাদ্যর অভাব কিছুটা হলেও সমাধান হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সেসন-৯

ছাগলের স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ঃ

ছাগল সাধারণত পরিষ্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উচু, উষ্ণ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলকারী পরিবেশ পছন্দ করে। গোবরযুক্ত, স্যাঁতসেঁতে, বদ্ধ অন্ধকার ও পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের রোগ বালাই যেমনঃ নিউমোনিয়া, চর্মরোগ, ডায়রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সংক্রামক ও পরজীবী রোগ হতে পারে। সেই সাথে ওজন বৃদ্ধির হার, দুধের পরিমাণ এবং প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়। গরীব প্রতিপালনকারীগণ ছাগলের ঘর গৃহ নির্মাণের অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে পারেন না। বন্য প্রাণী ও চোরের উপদ্রব ইত্যাদি কারণে নিজের বাস ঘরের এক কোণাতে ছাগলকে রাতে থাকতে দিয়ে থাকেন।

বাসস্থানের উদ্দেশ্যঃ

- ঝড় বৃষ্টিসহ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করা
- বন্য প্রাণি এবং চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করা
- বিশ্রামের জন্য আরামদায়ক পরিবেশ প্রদান করা
- শারীরিকভাবে সুস্থ রাখা
- রোগ প্রতিরোধ করা

ছাগলে বাসস্থানের জন্য বিবেচ্য বিষয় সমূহঃ

- পারিবারিকভাবে পালনের ক্ষেত্রে ছাগল সাধারণতঃ দিনের বেলায় বিভিন্ন জায়গায় চড়তে দেওয়া হয়। রাত্রে ঘরে এনে রাখা হয় এবং থাকার জন্য ঘরটি পর্যাপ্ত আলো বাতাসযুক্ত এবং স্বাস্থ্য সম্মত হওয়া প্রয়োজন।

- ছাগল মাচায় থাকতে পছন্দ করে। এছাড়াও ছাগলকে মাটিতে রাখলে ঠান্ডা লেগে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ছাগলকে মাটিতে রাখলে আঠালী উকুন পরজীবী রোগ দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয় তাই ছাগলকে মাচার উপর রাখা উচিত।
- ঘরের ভিতর বাঁশ, কাঠ দিয়ে মাচা তৈরী করে দিতে হবে।
- প্রতিপালনকারীর থাকার ঘরে বা গোয়াল ঘরের এক পার্শ্বে ২.৫’ × ৫’ বর্গ ফুট আকারের এবং $\frac{১}{২}$ থেকে ৩ ফুট উঁচু মাচার উপর বাচ্চাসহ অন্তত ৩টি ছাগল ৬টি বাচ্চাসহ রাত্রে একত্রে থাকতে পারে।
- শীতকালে মাচার উপর ১.০-১.৫ ইঞ্চি পুরু খড় বিছিয়ে তার উপর ছাগলকে রাখতে হবে। প্রতিদিন খড় পরিস্কার করে রোদ্রে শুকিয়ে পুনরায় বিছাতে হবে।
- তীব্র শীতের সময় ছাগী ও বাচ্চাদের গায়ে চট পেঁচিয়ে দেয়া যেতে পারে।
- মাচার নিচের অংশ এবং ঘর প্রতিদিন সকালে পরিস্কার করতে হবে।
- পৃথক ঘরের ক্ষেত্রে ঘর ভিটি থেকে কমপক্ষে ১ ফুট উচু হতে হবে। অবস্থাভেদে মাটি থেকে মাচার উচ্চতা ২ থেকে ৩ ফুট হতে পারে। মাচা থেকে চালের উচ্চতা ৫-৭ হাত হতে পারে। মাচার কাঠ অথবা বাঁশের মধ্যে ১ সে. মি পরিমান ফাঁক রাখতে হবে যাতে প্রস্রাব পায়খানা নিচে পড়ে যায়।
- গর্ভবতী ছাগল মাচায় যাতে সহজে উঠতে পারে এবং মাচা হতে যাতে সহজে নামতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘরের অন্যান্য ছাগল যাতে গর্ভবতী ছাগলকে আঘাত করতে না পারে বা গর্ভবতী ছাগল যেন কোন চাপে না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনে ঘরে আলাদা স্থানে গর্ভবতী মাকে রাখার বন্দোবস্ত করতে হবে।
- বাচ্চাসহ মাকে আলাদা মাচায় রাখতে হবে। কমপক্ষে ১ মাস বাচ্চাসহ মা’কে আলাদা করে রাখা প্রয়োজন।
- মাচা ও ঘরে সপ্তাহে ১বার ঘরের নীচে প্রস্রাব পায়খানা পরিস্কার করতে হবে।
- ফিনাইল বা অন্যান্য জীবানু নাশক ঔষধ দ্বারা ঘর ও মাচা মাঝে মাঝে পরিস্কার করতে হবে।

সেসন-১০

- ছাগলের প্রচলিত রোগ-বালাই পরিচিতি
- রোগের লক্ষণ, করণীয়, প্রতিষেধক ও নিরাময়

ছাগলের প্রচলিত রোগ-বালাই পরিচিতি ঃ

ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য নিয়মিত পিপিআর টিকা, কৃমিনাশক ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। ছাগলের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ পি.পি.আর এবং গোটপক্সের ভ্যাকসিন জন্মের ৩ মাস পরে দিতে হয়। বছরে দু’বার বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে) কৃমিনাশক এবং বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর) ব্রডস্ট্রোকট্রাম কৃমিনাশক যেমনঃ নেমাফেক, রেলনেক্স ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া যকৃত কৃমির জন্য ফেমিনেক, ডোভাইন ইত্যাদি খাওয়ানো যায়। কোন ছাগলের চর্মরোগ দেখা দিলে তাকে পাল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যে কোন নূতন ছাগল খামারে প্রবেশ করানোর আগে কমপক্ষে এক সপ্তাহ অন্যস্থানে রেখে পর্যবেক্ষণ করা উচিত যে তার কোন রোগ আছে কিনা। তাছাড়া ওলান পাকা রোগ সহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া বাঞ্চনীয়।
পালের সকল ছাগলকে একসাথে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। ছাগলের মারাত্মক রোগ, যেমন-পিপিআর, গোটপক্স হলে মাঠ সহকারী বা পশু চিকিৎসক এর সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাগলের তড়কা, হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া, এন্টারোটক্সিমিয়া, বিভিন্ন কারণে পাতলা পায়খানা ও নিউমোনিয়া রোগ হতে পারে। সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে এ সকল রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

রোগের লক্ষণ, করণীয়, প্রতিষেধক ও নিরাময় ঃ

ছবি ঃ পিপিআর আক্রান্ত ছাগল

ছবি ঃ একথাইমা আক্রান্ত ছাগল

ছাগলের পিপিআর (PPR) ঃ

বাংলাদেশে এই রোগটি সর্ব প্রথম ১৯৯৩ সালে ছাগলে দেখা দেয়। বর্তমানে রোগটি আমাদের দেশে ছাগলে মাঝে মাঝেই মহামারী আকারে দেখা দেয়।

লক্ষন ঃ

এই রোগে ছাগল প্রথমত ঝিম ধরে পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল নিঃসৃত হয়। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৬-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট) এবং পাতলা পায়খানা শুরু হয়। মলের রং গাঢ় বাদামী, মাঝে মধ্যে রক্ত মিশ্রিত আম থাকতে পারে। আক্রান্ত ভেড়াতে ব্যাপকভাবে নিউমোনিয়া দেখা দেয়, নাকের পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে ও শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। চিকিৎসা না করা হলে ৭-৯ দিনের মাথায় ছাগল মারা যেতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের সুনির্দিষ্ঠ কোন চিকিৎসা নেই তবে লক্ষন ভিত্তিক চিকিৎসা করালে মৃত্যুর হার কমানো যায়। রোগের শুরুতে পিপিআর রোগ থেকে বেঁচে যাওয়া ছাগলের রক্তের সিরাম সংগ্রহ করে আক্রান্ত ভেড়ার শিরায় প্রয়োগ এবং এর পাশাপাশি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়েটিক দিলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। পানি শুন্যতা রোধের জন্য ভেড়াকে মুখে বা শিরায় পর্যাপ্ত স্যালাইন দেয়া উচিত।

প্রতিরোধ ঃ

রোগ দেখা দেয়ার আগেই সুস্থ্য ছাগলকে পিপিআর টিকা দিতে হবে। তাছাড়া টিকাকৃত ছাগলের বাচ্চাকে তিন মাস পর্যন্ত পিপিআর রোগের এন্টিবডি থাকে। এই রোগে আক্রান্ত মৃত ছাগলকে পুড়িয়ে অথবা নিরাপদ দুরত্বে পুঁতে ফেলতে হবে।

বাদলা রোগ

প্রচলিত নামঃ

বাদলা কৃষ্ণাঙ্গ, জহর বাত, সুজওয়া রোগ ইত্যাদি।

রোগের কারণঃ

ইহা একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। ক্লোস্টিডিয়াম চভেয়াই নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমন এরোগের সৃষ্টি হয়।

সাধারনত বৈশিষ্টঃ

এ রোগে সাধারনত গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে ৬ মাস হতে ২ বছর বয়সের পশু এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

এটি একটি মারাত্মক রোগ। তীব্র রোগে আক্রান্ত পশু কোন লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ করে মারা যায়। আক্রান্ত পশু নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি দেখা যায়।

- আক্রান্ত পশু দলছাড়া হয়ে ঝিমাতে থাকে।
- প্রচন্ড জ্বর (১০৪°-১০৭°F) হয়।
- পায়ে ব্যাথ্যা হওয়ায় পশু খোড়া হয়।
- তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে উরুর উপরিভাগ, ঘাড়ে ও কোমড়ে কিছু অংশ ফুলা দেখা যায়।
- ফুলা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে।
- ফুলা জায়গায় টিপ দিলে পচ পচ শব্দ করে।
- আক্রান্ত অংশ কালচে দেখায়।
- ফুলা অংশ কাটালে বাতাস ও ফেনা যুক্ত রস বেরোয়।
- খাওয়া ও জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যায়।
- শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

চিকিৎসা ঃ
আক্রান্ত হবার সাথে পশুকে যথোপযুক্ত চিকিৎসা দিতে হবে। আক্রান্ত পশুকে এন্টিবায়েটিক দ্বারা চিকিৎসা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্ল্যাক কোয়ার্টার এন্টিসিরাম প্রোনাপেন ইনজেকশন, টেরামাইসন, ট্রিনামাইড ইত্যাদি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণঃ
গবাদী পশুকে প্রতিবছর নিয়মিত ভ্যাক্সিন/টিকা দিতে হবে। পশুর আবাসস্থল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

<u>ক্ষুরা রোগ</u>
প্রচলিত নাম ঃ বাতা, ঝরা, ক্ষুরপাকা, ক্ষুরাা, তাপা রোগ ইত্যাদি।

রোগের কারণঃ
ইহা একটি ভাইরাস জনিত ছোয়াচে রোগ। ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ ভাইরাস নামক একধরনের ভাইরাসের আক্রমনে এরোগের সৃষ্টি হয়।

সাধারন বৈশিষ্টঃ
এ রোগ সাধারনত বিভক্ষ ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণী যেমনঃ গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, উট, হরিণ ইত্যাদির বেশী হয়ে থাকে। শুকর, ঘোড়া ও অন্যান্য জোড় ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণীতে ও হয়ে থাকে। আমাদের দেশে প্রায় সব ঋতুতেই ক্ষুরা রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা যায় তবে, বর্ষা শেষে এর প্রকোপ বেশী দেখা যায়। মৃত্যুর সংখ্যা কমহলেও এ রোগে পশু অনেকদিন কষ্ট পায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন ও কার্যক্ষমতা খুবই কমে যায়।

রোগের লক্ষণঃ
- প্রাথমিক অবস্থায় পশুর শরীরের তাপমাত্রা অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় (১০১°-১০৭°F)
- মুখের ভিতর, জিহ্বা, দাঁতের মাড়ি ও পায়ের ক্ষুরের মাঝখানে ফোসকা পড়ে এবং তা ফেটে গিয়ে ঘা এর সৃষ্টি হয়।
- মুখ দিয়ে অনবরত ফেনাকৃতির লালা ঝরতে থাকে।
- মুখে কষ্ট হওয়ায় পশু মাঝে মাঝে জিহ্বা বেড় কের চপ চপ শব্দ করে।
- পশু ঘাস বা শক্ত খাবার খেতে পারেনা।
- পায়ে ঘা হওয়া পশু খুঁড়ে খুঁড়ে হাটে।
- পশুর নিকটে গেলে পচা গন্ধ পাওয়া যায়।

রোগের সংক্রমণঃ
- বাতাসের মাধ্যমে এরোগের জীবানু ছড়ায়
- আক্রান্ত পশুর লালার মাধ্যমে
- আক্রান্ত পশুর পড়ে যাওয়া ক্ষুর, ঘায়ের চাপ ইত্যাদির মাধ্যমে ও রোগ ছড়ায়।
- আক্রান্ত গাভীর দুধ খেলে বাছুরের এরোগ হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ
ভাইরাস জনিত রোগের কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত পশু সুষ্ক ও পরিস্কার জায়গায় রাখতে হবে। পটাশ মিশ্রিত অথবা নিম পাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এন্টিবায়োটিক বা সালফোনামাইড ইনজেকশন দিলে সুফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রনঃ

পশুকে প্রতিবছর নিয়মিত ভ্যাক্সিন দিলে সাধারনত এরোগ হয় না। রোগের স্ট্রেইন সনাক্ত করে সুস্থ্য পশুকে টিকা দিতে হবে। সুস্থ্য পশুকে আক্রান্ড় পশুর সঙ্গে মিশাতে দেয়া যাবে না।

কৃমি নাশক ঔষধ প্রয়োগ ঃ

কৃমি ভেড়ার শরীরে পুষ্টি শুষে ভেড়াকে দুর্বল করে দেয়। এক গবেষনায় দেখা গেছে ভেড়ার মোট সরবরাহকৃত পুষ্টির বিশেষতঃ প্রোটিনের ২০ শতাংশ কৃমি শুষে নেয় এবং মিউকাস আকারে প্রোটিন শরীর থেকে বের করে দেয়। এছাড়া ভেড়ার হজমেও এরা বাধা প্রদান করে থাকে। বহিঃ পরজীবি দেহের চামড়া ও পশমের মান নষ্ট করে এবং রক্ত শুষে নেয়। এ জন্য নিয়মিতভাবে বর্ষা ও শীতের আগে দুই বার খামারে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কৃমি নাশক দিতে হবে।

ডিপিং ঃ

বছরের বিভিন্ন সময়ে ভেড়া উকুন, আঠালী, মায়াসিস, মেইঞ্জ ইত্যাদি বহিঃপরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সকল বহিঃপরজীবি থেকে ভেড়াকে মুক্ত রাখার জন্য প্রতি মাসে নুন্যতম একবার ০.০৫% ম্যালাথায়ন দ্রবনে (১০০লিটার পানিতে ০.৫ লিটার ম্যালাথায়ন) ডিপিং করাতে হবে। খামারে চর্ম রোগে আক্রান্ত কোন ভেড়া থাকরে তাকে আলাদাভাবে আইভারম্যাকটিন ইনজেকশন ০.৫ সিসি পরিমান চামড়ার নিচে দিতে হবে এবং ২-৩ দিন পর পর রোগ সারা না পর্যন্ত ম্যালাথিয়ন ডিপিং (গোসল) করতে হবে। আইভারম্যাকটিন জাতীয় ঔষধ প্রতি ছয় মাস অন্তর ভেড়ায় প্রয়োগে অন্ত ও বহিঃ পরজীবি নিয়ন্ত্রনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

এক নজরে ছাগলের রোগ ও প্রতিকার ঃ

ক্র. নং	অসুখের নাম	কারণ	বিস্তার	লক্ষণ	টীকা/ঔষধ
১.	পি. পি আর	ভাইরাস	অসুস্থ পশুর সংস্পর্শের কারণে।	পিঠ বাঁকা করে দাড়িয়ে থাকে, নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল নিঃসরণ হতে থাকে। শরীরের তাপ মাত্রা বেড়ে যায় এবং পাতলা পায়খানা শুরু হয়।	চিকিৎসার ভাল ফল পাওয়া যায় না। তবে পানি শূন্যতা পূরণের জন্য স্যালাইন খাওয়াতে হবে। ৫ মাস বয়সে পি.পি.আর টিকা দিতে হবে। টীকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তিন বছর পর্যন্ত থাকে।
২.	নিউমোনিয়া	ব্যাকটেরিয়া	স্যাঁতস্যাঁতে বর্ষা, অনুপযোগী আবহাওয়া এ রোগের উৎস	প্রথম ঠান্ডা পরে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হওয়া	পরিস্কার, শুস্ক, মুক্ত বায়ু চলাচল উপযোগী বাসস্থান হতে হবে। পশু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
৩.	গোলকৃমি	পাকস্থলীর কৃমি	চারণভুমি, খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে বিস্তার	শরীর পাতলা হয়ে যায়। ডায়রিয়া হতে পারে, নাও হতে পারে এবং রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়।	মাঝে মাঝে কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে।
৪.	ফিতাকৃমি	পাকস্থলীর কৃমি	চারণভুমি, খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে বিস্তার	শরীর পাতলা হয়ে যায়। ডায়রিয়া হতে পারে, নাও হতে পারে এবং রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়।	মাঝে মাঝে কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে এবং কুকুর থেকে ছাগল পৃথক রাখতে হবে।
৫.	কলিজা কৃমি	কলিজায় জন্মায়	চারনভুমি, খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে বিস্তার	শরীর পাতলা হয়ে যায়। ডায়রিয়া হতে পারে, নাও হতে পারে এবং রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়।	মাঝে মাঝে কৃমি নাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে এবং শামুকমুক্ত স্থানে চারণ করতে হবে।

সেসন-১১

- ছাগলের বিভিন্ন টিকার নাম ও পরিচিতি
- প্রয়োগ পদ্ধতি, সময়কাল, কলাকৌশল

টিকার নাম	বয়স	টিকার মাত্রা ও প্রয়োগ পথ	মেয়াদ	সংরক্ষণ
পি. পি আর	ছাগল ৩ মাস	১ এম. এল. চামড়ার নিচে	৬ মাস পর পর	-৫° থেকে ০° সেলসিয়াস- তাপমাত্রায় ৬ মাস - ৪° থেকে ৮° সেলসিয়াস- তাপমাত্রায় ১ মাস

জৈব নিরাপত্তাঃ
খামারে কোন নতুন ছাগল আনতে হলে অবশ্যই রোগমুক্ত ছাগল সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫ দিন খামার থেকে দূরে অন্যত্র রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোন রোগ দেখা না দিলে ১৫ দিন পর পিপিআর ভ্যাকসিন দিয়ে ছাগল খামারে নেয়া যাবে। অসুস্থ ছাগল পালের অন্য ছাগল থেকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে। সকল ছাগলকে বছরে ৫-৬ বার ০.৫% ম্যালথায়ন দ্রবণে চুবিয়ে চর্মরোগ মুক্ত রাখতে হবে।

ছাগল বাজারজাতকরণঃ
সুষ্ঠু খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ১২-১৫ মাসের খাসী ২০-২২ কেজি ওজনের হয়। এ সময় খাসী বিক্রি করা যেতে পারে। অথবা খাসির মাংস প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করা যেতে পারে।

সমাপ্ত